দৈনিক বাংলা
081
তারিখ 07 AUG 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও ...

'হোম টাস্ক' ও শিক্ষার্থীর মৃত্যু

...স্কুলের [illegible] তৈরি করেনি বলে মা রেগে মেরে... মাত্র মেরেছে যে ছোট্ট মেয়েটি একেবারে মরাই গেছে। শরীরে বেকায়দা আঘাত পেয়ে প্রথমে বেচারী মেয়েটি জ্ঞান হারায়—পরে হাসপাতালে নেয়া হলে সে মারা গেছে বলে ডাক্তাররা জানান। ঘটনাটি ঘটেছে চীনের কুনহাই প্রদেশে এই জুলাই মাসে।

লিউ লীন এমন কিছু বড় ক্লাসে পড়ত না মাত্র তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ছিল সে। আবার হাবাগোবা বা ফাঁকিবাজ গোছের যে ছিল, তাও নয়, স্কুলের সেরা ছাত্রীদের সারিতেই তার নাম ছিল বলে জানা গেছে। কী যে হল একদিন মাত্র ও স্কুলের অংক করেনি। মা শুনে ফোঁপিয়া এক দফা পিটুনি দিলেও সে অংক খাতা হাতে তোলেনি। তার জিদ দেখে মা এমন কিলচড় লাথিই মারলেন যে লিন মরণের কোলে ঢলে পড়ল—হোমটাসক-এর জন্য মায়ের উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে দিল চিরদিনের জন্য। ওয়ার্কাস ডেইলী পত্রিকার এই খবরটি দৈনিক বাংলায় ছাপা হয়েছে গত পরশুদিন।

ঘটনাটি আমাদের মনকে গভীর ভাবে নাড়া দেয়। আপন মায়ের হাতে শিশুকন্যার মৃত্যু ভাবতে কষ্ট হয়। তবু তা সত্যিই। জননী যে মেয়েকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন তাও নয়। ব্যাপারটি আকস্মিকতাই। তবু এমন দৈব দুর্বিপাক যে কারণে ঘটেছে তা উড়িয়ে দেওয়ার নয়।

লীন-এর মা কর্মজীবী মহিলা ঘরে বাইরে শ্রম বন্টন করে নিয়ে চলছিলেন তিনি সন্দেহ নেই। প্রায় যন্ত্রের মত নিষ্প্রাণ কঠিন রোজনামচা বোধহয় তাঁর—এরই মধ্যে কন্যাকে ঘিরে হয়ত তাঁর স্বপ্ন অনেক। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রীর মা যখন, তখন কতোই বা আর তাঁর বয়স—হয়তো নিতান্তই তরুণী। তাই প্রয়োজনীয় ধৈর্য সহিষ্ণুতা হয়ত তেমন করে তাঁকে স্থিত করেনি, দুর্বার আবেগ আর আদর্শমন্ডিত আপোষহীন মনই ছিল তাঁর চালিকাশক্তি। ঠিক হার না মানলেও চাপা পড়ে গিয়েছিল এক দুর্দান্ত ঔচিত্যবোধের কাছে তার হৃদয়ের নিভৃতে ফল্গু ধারার মত প্রবাহিত মমতা, স্নেহ প্রীতি। কন্যা অংক করেনি বলে তিনি সুখী হননি—মেধাবী কন্যা স্কুলে লজ্জা পাবে, হয়ত শাস্তিও এ চিন্তায় অধীর হয়ে তিনি আর কিছু সে মুহূর্তে ভাবতে পারেননি। দিনভর বাইরের খাটুনিতে তাঁর মন হয়ত বিষিয়ে ছিল, হয়ত তিনি শ্রান্ত ছিলেন বড় বেশি কিংবা বলা যায় না ব্যক্তিগত বা পেশাগত [illegible] কোন অন্তর্জ্বালা বা [illegible] সেই মুহূর্তে তাঁকে [illegible] মারছিল কিনা, কোনও [illegible] অশুভ ঘটনা [illegible]

মেয়েটির স্কুলের যশখ্যাতিতে কালো দাগ পড়বে বলেই তো? একদিনের বাড়ির কাজ না করায় তার স্কুলের গ্রেডিংস নেমে যাবে—এই শংকাই তো? কিন্তু এ আশংকা বা উচ্চাশা কতটা সঙ্গত? শিশুমন যন্ত্র নয়—নয় স্কেল ফিতা দিয়ে মেপে চালানোর মতোন। শুধু শিশু বা কিশোরমন কেন—মানুষের মনে রইতো যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। খেয়াল-খুশী বা নিয়ম ভাঙার প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ—হঠাৎ আনন্দই অর কাছে শ্রেষ্ঠ ধন। নিয়ম শৃংখলার প্রতি অবমাননা এ নয়, এ হচ্ছে আপন মনের কাছে আপনার সমর্পণ।

চিরন্তন মানব শিশুর ক্ষেত্রে এই বিশিষ্টতার প্রকাশ আরও প্রকট, কেননা বস্তুময় বিশ্বের বাস্তবজ্ঞান তাকে স্পর্শ করে না, প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা, যশখ্যাতি কামনা তাকে উদ্বেল করতে পারে না—তার কাছে বড় তার ভালো-লাগা। এ ভালো-লাগা উদ্দেশ্যবিহীন ও তাৎক্ষণিক, তাই তা অনাবিল, নির্মল। এমন মনের কাছে জাগতিক লক্ষ্য তুচ্ছ, মূল্যহীন তাকে ঘিরে আবর্তিত অভিভাবকের বাসনা কামনা স্বপ্ন, আপন সুখেই এ বয়সের মন নিমগ্ন।

মানব চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি আজকের দিনে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। ধনমানের ধ্যানে আজকের মানুষ স্বেচ্ছায় হত্যা করছে মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো ছিঁড়ে দিচ্ছে তার সুবিমল সৌন্দর্য। বস্তুসর্বস্ব এ কালে যান্ত্রিকতারই পূজনীয় আসন।

ঠিক এই বোধ আর বুদ্ধির তাড়নায় আজকের মানুষের মধ্যে এক অস্বাভাবিক দ্রুততা দেখা যায়, কে কতো দ্রুত সব পেয়ে যেতে পারে—তার জন্য অবর্ণনীয় ব্যগ্রতা ধরা দেয়। নিজের পক্ষে যা সম্ভব হয়নি—তা সন্তানের মধ্যে পেতে ব্যাকুলতা পরিলক্ষিত হয়। এ কারণেই নির্দিষ্ট বয়সের আগে সন্তানকে স্কুলে দিতে বাবা-মা অধীর হন এবং দিয়েও দেন।

যে বয়সে শিশুমন মাকে চায় সব সময়, সে সময়েই তার ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য তাকে মা ছেড়ে একটি নির্দিষ্ট সময় থাকতে হয়। ঘরে ফিরেও তাকে স্কুলের পড়ার জন্য ব্যস্ত রাখা হয়। এতে করে শিশু স্বাভাবিকতা হারায়, তার মনের সহজাত স্ফুরণ ব্যাহ[illegible]র [illegible] মত [illegible]

বিকাশ, বলা কঠিনই। একদিন স্বপ্ন লাগেই, সংঘাত বাধেই। এ অন্তর্ঘাত চর্মচোখে দেখা যায় না। হয় শিশু 'স্টাফ' হয়ে অতি মেধার প্রকাশ দেখিয়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠা পায় এবং তার মধ্যে আর কী হওয়ার ক্ষমতা ছিল, তা চিরকালের মত তলিয়ে যায়, নয় তো নিজেই তথাকথিত অযোগ্যতা প্রধান হয়ে বাস্তবের সঙ্গে তাকে সম্পর্কহীন করে দেউলে করে দেয়—তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

যুগকালের মানুষের এই মন-মানসিকতার সঙ্গে যোগ হয়েছে শিক্ষা পদ্ধতির অন্তঃসার শূন্যতা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক বিবেকহীনতা। শৈশব থেকে যে পরিমাণ 'বিষয়' পড়ানো হয়, তা আজ বিতর্কের বিষয়। তার ওপর শুরু হয়েছে শ্রেণীকক্ষে না পড়িয়ে শুধু 'বাড়ির কাজ' দেওয়ার অশুভ প্রথা। 'বাড়ি থেকে কাজ করে' আনার যে নিয়ম, তার মধ্যে শিশুর অভ্যাস গঠন ও শৃংখলার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জানানোই প্রধান লক্ষ্য ছিল—কিন্তু সেই বাড়ির কাজের কলেবর এখন এমন অবস্থায় গেছে যে বাবা-মা আজকাল এজন্যই বিশেষভাবে গৃহশিক্ষকের আশ্রয়ী হতে বাধ্য হন। অনেক ক্ষেত্রে বাবা-মা পালা করে হোম টাসক করে দেন। সময় সংকুলান হয় না বলে বিকেল বেলা কচি শিক্ষার্থীকে ঘরে আটকে রেখে 'স্কুলের কাজ' করিয়ে নেওয়া হয়, অভিভাবকেরা সন্ধ্যার পরে ব্যক্তিগত সামাজিকতা সন্তানের স্কুলের টাসক সেরে দেওয়ার জন্য এড়িয়ে চলেন।

এত সব কেন? ছেলেমেয়ে ছাত্রছাত্রীকে মানুষ করার জন্য। যুগোপযোগী শিক্ষাদানের নামে তাদের যন্ত্রমানব বানানোর এই যে আয়োজন, তা এক ধরনের প্রহসন। শিক্ষার্থীর মন উপেক্ষিত। তার শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা বিচার গৌণ। তার বয়স চার শেষ হলেই হল। অমনি 'চলো, চলো, স্কুলে চলো'। শিশুর কান্নায় থমকে যায় না মায়ের মন. তিনি জোর করে টেনে হিঁচড়ে তাকে ক্লাসে বসিয়ে চলে আসেন। চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিলে শিক্ষক বিরক্ত হন, ভয় দেখান। শিশু ভীত হয়ে দৌড়ে পালায়। ঘরে নিয়ে বাবা-মা শাসনে শাসনে তটস্থ করে ছাড়েন।

[illegible] শিক্ষার্থী ভীতই [illegible]

গেলে অভিভাবকের আশা মিটবে না।

যে কিশোর-কিশোরীর মন মানবিক বিভাগে উৎসাহী, বৈষয়িক কারণে তাকে "বিজ্ঞান বিভাগে" ঠেলে দেওয়ার জন্য কাঠখড় পোড়ানো হয়। কারণ তাকে ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার বানানো চাই—নইলে রক্ষা নেই।

আরও প্রশ্ন আছে। জীবনে পরীক্ষার কৃতিত্বই কি সব? সাধারণ মান, সাধারণ অবস্থান কি এতোই ধিককৃত? প্রতিযোগিতা ভালো, অসাধ্য সাধনের সাধনাও প্রশংসনীয়—কিন্তু লক্ষ্য অর্জিত না হলেই কি সব শেষ হয়ে গেল?

জীবন জটিল। কুসুমাস্তীর্ণ নয়। ছাত্রজীবনের ঔজ্জ্বল্য দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের এবং মর্যাদামন্ডিত হওয়ার লক্ষ্যে যাঁরা সন্তানকে পরিচালনা করেন তাদের মন যে স্বাভাবিক, তা বোঝা যায়, কিন্তু যাঁরা ছাত্রজীবনের কৃতিত্বকে সংসার-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠার মসৃণ পথ মনে করেন—তাঁরা বিভ্রান্ত। জ্ঞান অর্জনের অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানী হওয়ার সঙ্গে বিত্তবান হওয়ার সম্পর্ক তেমন নেই। বরং এ দুয়ের বিরোধ প্রকট। প্রকৃত শিক্ষার কাছে অর্থলিপ্সা পরাভূত, আবার অর্থ-পিপাসু মনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কম অনুভূত।

এ কারণেই অভিভাবককে ঠিক করা দরকার, তিনি কী চান, কোনটা চান। সন্তান রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি বলে সেই ক্ষোভেই কি তাকে কেউকেটা বানিয়ে শখ মেটাতে হবে?

সফলতা সকলের লভ্য নয়। সাফল্য সবার কাছে সমানভাবে ধরা দেয় না—যদিও সফলতা বা সাফল্যকে স্থূল বা জাগতিক অথবা বৈষয়িক অর্থে ধরা হয়। তাই বলে জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে—এ ধারণা ঠিক নয়। ব্যক্তিকতাকে শ্রদ্ধা করে তার গুণাবলী অন্বেষণ করে বের করে নিতে পারলে দেখা যাবে—মানবসন্তান অক্ষম নয়। এ অন্বেষণের দায়িত্ব অবশ্যই সমাজের কিন্তু সমাজ যখন অপারগ, তখন এ দায়িত্ব পড়েছে বাবা-মার ওপর। তাঁদের সন্তানকে তাদেরই উপলব্ধি করতে হবে. অন্যের মেধাবী সন্তানের সঙ্গে প্রতিযোগিতার হাতিয়ার করা অসমীচীন হবে, সন্তানকে তার নিজের বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিতে হবে। যদি ভাগ্যচক্রে তার মধ্যে তেমন বিশিষ্ট [illegible] প্রতিভাত না-ই হয়, তাহলেও তাকে তার মতো করে গড়ে উঠতে সহমর্মিতা দিতে হবে—তাকে অন্য কেউ-র মত করে তৈরি করার অথবা নিজেদের চাহিদামাফিক গড়ে তোলার চেষ্টা ছাড়তে হবে।